OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 473 - 481
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : প্রতিবাদী কণ্ঠের বহুমাত্রিক স্বর

শ্রুতকীর্তি বৈতালিক
প্রাক্তন ছাত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: srutiranjan121@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Common people, exploitation, communist society, new era, protest, hypocrisy, optimism, humanitarianism.

Abstract
A notable poet-personality in the modern Bengali poetry movement after Rabindra is Subhash Mukherjee. The poet emerged during the extreme crisis of national life in the forties of the twentieth century. Contemporary society and time deeply controlled his creation. This consciousness of the times is embodied in poetry to a greater extent than it is in his prose writings. Abandoning the path of conventional romanticism, he made the harsh social reality the main subject of his poetry. He was a humanist poet. He felt deeply pained by the suffering of the common people, exploited and oppressed in all aspects of society, economy, and politics. Therefore, he dreamed of a social system without exploitation to give true dignity to the humiliated people. He thought that a day would come when the cry of the aching, deprived, human soul would find its way to liberation through the path of class struggle. Poet Subhash Mukherjee dreamed of this new era or red-tinged day throughout his life. As a result, the tone that is particularly striking in his poetry in bringing about that desired day is protest. This protest is a protest against all kinds of exploitation, against hypocrisy, and against lack of ethics and morality. The optimistic poet's language of protest was not only unilinear; it was multidimensional. While protesting against the molten, stagnant, selfish social system, he directly attacked it, as well as indirectly inflicted a severe blow of satire. Again, in the case of writing love poems, he abandoned the conventional path and remained steadfast in his ideals.

Discussion

সময়টা ছিল চল্লিশের দশক। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রেশ কাটিয়ে না উঠতে উঠতে বিশ্বমানসের সামনে দেখা দিল আর একটি প্রাণনাশী মহাযুদ্ধ। যার কবলে পড়ে মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল নিজেদের মানবিক মূল্যবোধ। ঠিক সেই সময়ে কপালে রক্তচন্দনের অদৃশ্য তিলক, চোখে সাম্যবাদের স্বপ্ন আর কণ্ঠে একরাশ প্রতিবাদ নিয়ে কাব্যজগতে আবির্ভূত হলেন পদাতিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৯ সালে মাঘ সংক্রান্তিতে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হয়তো এইজন্যই বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছিলেন—

> "... তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না;"[১]

তিনি ব্যক্তিজীবনের প্রথম দিকে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কাব্যক্ষেত্রে রাজনীতির আনয়নকে অনেক সমালোচক ভালো চোখে না দেখলেও তিনি রাজনীতিকে মানবতা ও দেশাত্মবোধের মূল স্তম্ভ হিসাবে দেখেছেন। এই রাজনীতির সঙ্গে থেকেই তিনি সহজে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশতে পেরেছিলেন। যার ফলে সমাজজীবন থেকে গৃহীত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে উঠলো তাঁর কবিতার মূল রস। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চোখের সামনে লক্ষ করলেন সমাজজীবনে অবিরাম ঘটে চলা দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচারের কালো মেঘ। এই দুর্যোগবহুল কালো মেঘকে মানবজীবন থেকে সরিয়ে কয়েক ফোটা আলোর দিশা দেখাতে তিনি তাঁর কবিতায় নিয়ে এলেন চরম প্রতিবাদ। তাই যে কবিতা বীণা হয়ে বেজেছিল এতদিন - তা সুভাষের হাতে এসে অস্ত্র রূপে ঝলসাতে শুরু করে। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন—

"বজ্র কণ্ঠে তোলো আওয়াজ,
রুখবো দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।"[২]

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ জীবনে তিনি একাধিক গদ্য, ছড়া, কবিতা (মৌলিক ও অনুবাদ) লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ গুলি হল— 'পদাতিক' (১৯৪০), 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকুট' (১৯৫০), 'ফুলফুটুক' (১৯৫৭), 'যত দুরেই যাই' (১৯৬২), 'কালমধুমাস' (১৯৬৬), 'এই ভাই' (১৯৭১), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২), 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯), 'জল সইতে' (১৯৮১), 'চই-চই চই-চই' (১৯৮৩), 'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫), 'যা রে কাগজের নৌকা' (১৯৮৯), 'ধর্মের কল'(১৯৯১) 'একবার বিদায় দে মা' (১৯৯৫), 'ছড়ানো ঘুঁটি' (২০০১) ইত্যাদি।

নিজের সমকালে দাঁড়িয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছিলেন সমাজজীবনের ওপর কতগুলি ব্যাধি অভিশাপ রূপে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। যেগুলি শুধুমাত্র স্বদেশ বা স্বাধীনতা সম্পর্কিত নয়, সমগ্র মানব সমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ। এই ব্যাধি কেবল স্পর্শকাতর যুবসমাজের সজীবতাকে ধ্বংস করে দিল না সেই সঙ্গে নষ্ট করে দিল তাদের রাজনৈতিকবোধ। মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবি ক্রমেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে রাজনীতি মানবসমাজ থেকে দূরে নয়। তিনি তথাকথিত বামপন্থি রাজনীতিতে বিশ্বাসী হলেও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল ভিন্ন। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল মানব-কল্যাণমুখী এক সৃজনশীল বস্তু। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে সংযোগহীন দূরত্বে থাকলে চলবে না। তাই সংকীর্ণ স্বার্থ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে রাজনীতির হাত ধরে মানুষের কাছে পৌঁছলেন তিনি। রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন—

"মানবতা আর দেশাত্মবোধ থেকে রাজনীতি মোটেই দূর অস্ত নয়।"[৩]

প্রেম যেমন কোনো কবির সৃষ্টির উদ্দীপন রূপে কাজ করে, মৃত্যু যেমন কোনো কবির অনুপ্রেরণা রূপে কাজ করে ঠিক তেমনভাবে রাজনীতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তপ্রেরণা রূপে কাজ করেছে। আর এই রাজনীতি-নির্ভর প্রতিবাদী কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে মানব জীবনের বিশ্বস্ত দলিল।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক দেশ হিসাবে ভারতবর্ষে নেমে আসে যুদ্ধের ভয়াল মেঘ। প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার ঝুলি তখন পরিপূর্ণ। সেই সময় কিছু স্বপ্ন-পিপাসু মানুষ লাল রক্তের পঙ্কিল রণভূমিতে দাঁড়িয়ে ফুল নিয়ে বসন্ত উৎসবে মেতে ওঠে। সমাজ-সচেতন কবির চোখে যেটা বিলাসিতা ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে হয়নি। তাই এই ফুলের প্রতি তীব্র ঘৃণা বর্ষণ করে মানুষকে ঘুমঘোর থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি উচ্চারণ করলেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।"[৪]

মানুষ জন্মের পর প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এই চিরন্তন সত্যটা জেনেও সে উট পাখির মতো আসন্ন বিপদ থেকে ঘাড় গুঁজে বাঁচতে চায়। কিন্তু এই বাঁচা প্রকৃত বাঁচা নয়। তাই মৃত্যুভয়ে ভীত এই মানুষদের ভয়ের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে কবি বলেন—

"শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।"[৫]

জীবনের পথ সোজা নয়, বন্ধুর। জীবনসমুদ্র পেরোতে হলে দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। তবুও মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। কারণ এগিয়ে যাওয়াটাই জীবনের ধর্ম। তাই কবি সমকালীন জড়তা, স্থবিরতার বিরুদ্ধে গিয়ে নতুন যুগ আনার ডাক দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তিনি বলেন—

"কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে
কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?"[৬]

কবি বিশ্বাস করতেন সমাজ পরিবর্তনের এই মঙ্গলময় যজ্ঞের হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলনের ভার কোনো একক ব্যক্তির দ্বারা বহন করা সম্ভব নয়। তাই কৃষক, শ্রমিকসহ সমাজের সর্বস্তরের শোষিত মানুষদের সঙ্গে থেকেই তিনি নবযুগ আনতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর কবিতায় আমরা দেখতে পাই গোষ্ঠীস্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি চরম আঘাত হানার সংগ্রামময় চিত্র। তিনি বলেন—

"আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি;
একাকি চলতে চাইনা এরোপ্লেনে;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষ নেওয়া যাবে শেষ কার পথ জেনে।"[৭]

পদাতিকের সব কবিতাতে এত স্পষ্ট সংগ্রাম বা প্রতিবাদের কথা নেই। কোথাও কোথাও বক্রোক্তিতে প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন - 'প্রস্তাব, ১৯৪০' কবিতায় দেখা যায় তিনি বলছেন—

"অস্ত্র মেলেনি এতদিন তাই ভেজেছি তান।
অভ্যাস ছিল তীর ধনুকের ছেলে বেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান-
বলব, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়
চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেশের সাধারণ মানুষ যখন নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবাদের দিকে এগোচ্ছে, সেই সময় সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগী মানুষদের স্থিতাবস্তা বজায় রাখার আকুলতা লক্ষ করা যায়। এই ভণ্ড সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী মানুষদের প্রতি চরম ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সবসময় শোষণহীণ সাম্যময় সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। পুঁজিবাদের কবলে পড়ে সেই সমাজ গড়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হতে দেখে তিনি প্রতিরোধে ফেটে পড়েন। এই বিষয়য়ে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'বধূ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্যে 'বধূ' নামে একটি কবিতা থাকলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বধূ' কবিতাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রখর বাস্তববাদী কবি এখানে একদিকে যেমন যান্ত্রিক শহরজীবনে সাধারাণ মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও তা থেকে উত্তরণের লড়াই ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি অন্যদিকে নাগরিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্য রূপকে তুলে ধরতে ভুলেননি। তিনি বলেন—

"পাষাণ-কায়া হায়রে, রাজধানী!
মাশুল বিনা স্বদেশে দাও ছেড়ে;
তেজারতির মতন কিছু পুঁজি
সঙ্গে দাও, পাবে দ্বিগুণ ফিরে।"[৯]

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু প্রাপ্তির প্রত্যাশিত পথ ধরে মানুষ পেল না তার মাতৃভূমির কাঙ্ক্ষিত রূপ। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দ্যায় ভেঙ্গে পড়ল সমাজ ও সংসারের মূল ভিত্তি। চারিদিকে বেকারত্বের জ্বালা যখন ক্রমবর্ধমান এমন সময় কতিপয় দেশনেতা যারা তথাকথিত 'বাবা' বলে পরিচিত ছিলেন তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে সহ্য করার পরামর্শ দেন। ব্যক্তিস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদ নিয়ে এক আপোষমূলক মধ্যবিত্ত প্রবণতায় তারা গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে। সময় সচেতন কবি এই সৃষ্টিহীন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। তাই তিনি এই তথাকথিত 'বাবা'দের ধিক্কার জানিয়ে বলেন—

"বাবা বলেন এমনি করে
সারা রাস্তা ধৈর্য ধরে
মড়া টপকে
মড়া টপকে হাঁটা
বাবারা যা বলেন তা কি ঠিক?
এও ভারি আশ্চর্য
গা বাঁচাবার নাম দিয়েছেন সহ্য।
বাবাদের ধিক
বাবাদের ধিক
বাবাদের ধিক।"[১০]

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমকালে দাড়িয়ে এক সময় লক্ষ করলেন মানুষ গতানুগতিক ভাবে চলতে চলতে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, কোন নতুন সম্ভাবনা বা নতুন সংবাদে তার আর কোনো উৎসাহ নেই। তাই প্রত্যেক দিনই কবির কাছে সৃষ্টিহীন ব্যর্থ বলে মনে হয়েছে। একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে কবি এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর 'সকলের ভাবনা' নামক একটি কবিতায়। যার শেষ অংশটা এরকম—

"হাত মুঠো করছি
আর খুলছি
মুঠো করছি
আর খুলছি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে দিনটাকে আমি চাই
কিছুতেই মিলছে না।”[১১]

মেঝেতে এসে সকালের কাগজগুলো ‘ঠাস ঠাস করে চড় মারবার শব্দে’ পড়ছে তো পড়ছেই। এখন প্রশ্ন জাগে, এই চড় কি সত্যই মেঝেতে পড়ছে? নাকি আমরা যারা প্রত্যেক দিনের কাজকে তার আগের দিনের জেরক্স কপি বলে ভাবি। আমরা যারা সৃষ্টিহীন বাঁজা সকলের বোকা অনুগামি, আমরা যারা গতানুগতিকতায় বিশ্বাসী, আমরা যারা আহার নিদ্রা মৈথুন ছাড়া কিছুই জানি না, তাদের গালে এসে পড়ছে? হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের জাগরণ ঘটিয়ে কবি সুভাষ এই কবিতায় একদিকে পৌরুষহীন আমাদের খোলস উন্মোচন করেন অন্যদিকে একটা লাল টুকটুকে দিনের জন্য খুলে দিতে থাকেন আশাবাদের মুঠো।

মানব প্রেমিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় শোষক শ্রেণির কাছ থেকে মানুষের সাধারণ অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে প্রতিবাদমুখর ধর্মঘটে সামিল হন। তিনি সাধারণ মানুষকে একত্রিত করে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ডাক দেন—

“স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! যেখানে থাকি ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! একবার লাখো হাত এক হোক দেখে নেব পশুরাজকে
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! দোকানে কপাট, দপ্তরে চাবি ট্রাম বাসে চাকা বন্ধ
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! বিজলীর চোখে গেলে দাও করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! ডাক্তার ভাই! টেলিফোন বোন ভয় নেই পাশে আমরা
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! দুঃশাসনের পাঁজর খুলবো গা থেকে খসাবো চামড়া।”[১২]

শুধু ধর্মঘট নয়, সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণির হাত থেকে বাঁচতে তিনি শিকল ভাঙার শপথ নেন। প্রতিবাদী কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

“দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের ভিত পড়ো পড়ো
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা নাঙ্গারা জড়ো।
শানানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে
সোজা জিজ্ঞাসা
দুশো বছরের রক্ত শুষেও
মেটেনি পিপাসা?
বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌঁছয় ডাক
যেখানে যে আছো ময়দানে সব এক হয়ে যাক।
কড়া পড়া হাতে শিকল ভাঙার
শপথ কঠিন
আমাদের হবে কলকারখানা জায়গা জমিন।”[১৩]

দেশ জুড়ে যখন অর্থনৈতিক মন্দা চরম আকার ধারণ করেছে, সাধারণ কৃষকশ্রেণির রক্ত জল করে ফলানো ফসলের মূল্য যখন ক্রমহ্রাসমান তখন মজুতদার মালিক শ্রেণির দল নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে ঋণের বোঝা। জোর করে আদায় করছে খাজনা। কবি এই শোষণমূলক অন্যায় অবিচার সহ্য করতে পারেননি। তাই মালিক শ্রেণির ভীত কাঁপাতে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

“পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জ্বলে উঠবে আগুন।”[১৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। ব্রিটিশ শক্তি যে ভারতবাসীর রক্ত দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, সেই রক্তে ডুবে মরতে হবে তাকে। সাধারণ মানুষের কর্মকাণ্ড অন্ধকারের বুক চিরে আলোর দিকে এগিয়ে যাবে। নতুন ফসলে ভরে উঠবে বসন্ত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে তাহলে অগ্নিকোণের পোড় খাওয়া মানুষ তাদের লাঙলের ফালে এবং কাস্তের মুখে কেটে ফেলবে তার মাথা। এই নিদারুণ প্রতিবাদ লক্ষ করা যায় ‘অগ্নিকোণ’ কবিতাটিতে। তিনি বলেন—

“ঘুম ভেঙ্গে ওঠা অগ্নিকোনের মানুষ
রক্তের পাঁকে শত্রুকে পুঁতে
অন্ধকারের বুকে হাঁটু দিয়ে দুহাতে আনে
দুঃশাসনের ভিৎ।”[১৫]

তারা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে—

“দিন এসে গেছে, ভাইরে-
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার।
দিন এসে গেছে, ভাইরে-
বিদেশীরাজের প্রাণভোমরাকে
নখে নখে টিপে মারবার।
দিন এসে গেছে
লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে
ফেলবার।
দিন আসে, ভাই
কাস্তের মুখে নতুন ফসল
তুলবার।”[১৬]

অনেকেই মনে করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমের কবিতা লেখেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রেমের কবিতা দিয়ে কাব্যজগৎ শুরু না করলেও পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় প্রেম বিশেষভাবে উঠে এসেছে। তবে তাঁর রচিত প্রেমের কবিতা প্রথাগত প্রেমের কবিতার থেকে পুরোপুরি আলাদা। আর এখানেই ফুটে ওঠে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং প্রচলিত প্রেমমূলক কবিতাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আসলে এই সমাজ, দেশ ও মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। সেই জন্যই ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও যৌবনকে তিনি সহজেই উপেক্ষা করেন। কিন্তু তিনি তো মানুষ, তাই কখনও কখনও নিজের জন্য দরকার হয় ধন নয়, মান নয় একটুকু ভালোবাসা। কবি যে সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত সেখানে কোন সুন্দরী হরিণনয়না লাস্যময়ী নারী তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। কেননা তারা শুধু নারী, জন্মদাত্রী, শয্যাসঙ্গিনী, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় ‘নির্বোধ মাংসের স্তূপ’। সীমাহীন ভালোবাসাকে খুঁজতে গিয়ে কবি দেখতে পান ‘মিছিলের মুখ’। কবির চোখে তাঁর স্বপ্নের নায়িকা ধরা পড়ে কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে। কবি চলতে চলতে দেখতে পান—

“ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চুড়ায়
ফসফরাসের মতো জ্বল জ্বল করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ।”[১৭]

যে মুখের দিকে তাকিয়ে অশান্ত কবি শান্ত হন, খুঁজে পান সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চোখে নারীর সৌন্দর্যের ধারণা ছিল একটু অন্যরকম। তিনি সৌন্দর্য দর্শনের প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করে সৌন্দর্যচেতনাকে শৃঙ্খলামুক্ত করেছেন। কবি সৌন্দর্যকে সমষ্টির উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই ব্যক্তিগত সৌন্দর্য-পিপাসু মানুষদের প্রতি চরম প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি 'সুন্দর' নামক কবিতায় নারীর সৌন্দর্যকে ব্যক্তি সীমা ভেঙে সামগ্রিক ভাবে রূপ দান করেছেন। সাধারণভাবে দমকা হাওয়ায় যখন নারীদের আঁচল উড়ে তখন তাদের সৌন্দর্য বিশেষ এক মাত্রা পায়। কিন্তু তখনও প্রেমিক কবির চোখে সেই নারী সুন্দর হয়ে ওঠেনি। আবার যখন বিকালের পড়ন্ত রোদের তাপে প্রিয়তমা নারীর মুখ ঘেমে গিয়ে বিন্দু বিন্দু মুক্তোর মতো ঘামের ফোটা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছে যা দেখলে মুগ্ধ ও বশীভূত হয়ে যাওয়ার কথা, তাও কবির চোখে সুন্দর হয়ে উঠল না। একটা সময় এল যখন প্রিয়তমা নারী গোটা আকাশ উদ্ভাসিত করে হেসে উঠেছিল, সেই সুন্দর হাসি দেখেও প্রেমিক কবি মুগ্ধ হলেন না। কবিতার শেষ অংশে যখন দেখা যায় কর্মচঞ্চল মানুষ সারাদিন পশুর মতো পরিশ্রমের পর মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো অবস্থায় হু হু করে প্রকাশ্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। সেই জনসমুদ্রের ভিড়ে কাউকে আর আলাদা করে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না, সব মানুষ যেন সৃষ্টির নতুন গানে মেতে উঠেছে। আর সেই গান করতে থাকা জনসমাগমে মিশে গেছে প্রিয়তমা নারী। কবির চোখে তখনই সেই নারী সুন্দর হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন—

"যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল
তখনও নয়
বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মতো জ্বলছিল
তখনও নয়
কি একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত করে
তুমি যখন হাসলে
তখনও নয়
যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি করে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না-
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।"[১৮]

সৌন্দর্যের স্তর পেরতে পেরতে কবি এখানে প্রচলিত সৌন্দর্যবোধকে একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা ছিল অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত। মানুষ হয়েও মানুষ তাদের কখনো চোখের জলের হিসাব নেয়নি। সামজিক বিবাহ বন্ধনের জাঁতাকলে পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে তাদের সমস্ত স্বাদ-আহ্লাদ। তাইতো কালোকুচ্ছিত এক আইবুড়ো মেয়ে সপ্ন দেখেছিল এক নতুন জীবনের। যেখানে তার একটি সুখের নীড় হবে। কিন্তু তার সপ্ন সমাজ ও সময়ের চাপে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কোকিলের ডাক নকলকারী এক হরবোলা ছেলে ও এক লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি যেন তাকে সপ্ন দেখিয়ে তার মনের মধ্যে মিথ্যা বসন্ত এনেছে। তার রঙ কালো বলে একদিকে সে যেমন অপাংক্তেয় অন্যদিকে অর্থের অভাবে তার বিয়ে হয় না। আসলে কবির চোখে সমকালীন সময়টা যেন হয়ে উঠেছিল ওই কালোকুচ্ছিত মেয়ের প্রতিরূপ। এই সমাজ ও সময়ের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ জানিয়ে কবি আনতে চেয়েছিলেন নতুন বসন্ত। যে বসন্তে ফুল না ফুটলেও তার সৌরভ টুকু অনুভব করা যায়। তিনি বলেন—

"ফুল ফুটুক না ফুটুক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আজ বসন্ত।
লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধরে
এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল-

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরন! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!
তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।
অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।।"[১৯]

এইভাবে মানবপ্রেমিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সর্বোপরি মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজের কবিতাকে করে তুললেন মানব কল্যাণের মূল সুর। যে সুরে একদিকে যেমন শান্ত ধ্বনি রয়েছে অন্যদিকে বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এসেছে সংগ্রামের, প্রতিবাদের ভাষা। তাইতো কবি বলেন—

"লক্ষ লক্ষ হাতে
অন্ধকারকে দু-টুকরো ক'রে
অগ্নিকোণের মানুষ
সূর্যকে ছিঁড়ে আনে।
...
পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে।।"[২০]

কবির কবিতাগুলিতে বিপ্লবের চড়া সুর ধ্বনিত হওয়ায় অনেক সময় হয়তো কাব্যগুণ ব্যাহত হয়েছে বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। কিন্তু এটাই সত্য যে, প্রতিবাদের জন্য ঠিক যেমনটাই প্রয়োজন, তেমনটাই তিনি তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বরং অনেক সময় চুপি চুপি করে এমন কয়েকটি কথা বসিয়েছেন যেগুলি মানুষের মনকে আরও বেশি করে ভাবিয়ে তোলে। এই নিঃশব্দ সত্তাবিপ্লবের ফলেই তাঁর কবিতা একদিকে যেমন অতিকথনের আবেগী বক্তব্য স্থাপনের দিক থেকে সরে এসেছে, তেমনি সরে এসেছে আকস্মিক সাম্প্রতিকতার অভিঘাত থেকেও। তাই একদিন যাকে আমরা বলতে দেখেছি 'জাগুন জাগুন পাড়ায় আগুন' তাঁরেই কণ্ঠে আবার শুনি—

"এদেশ আমার গর্ব
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ সহস্র বাসনা।"[২১]

মাটির স্নিগ্ধ গর্ভ থেকে যেন বা এভাবেই নতুন রূপে মুকুলিত হল এক চিরকালীন প্রেমিক। তার প্রেম হল মানবপ্রেম। তাই মানুষকে অমানবিক কর্মকাণ্ড থেকে মনুষ্যত্ববোধে উত্তীর্ণ করার জন্য কবি যে পথে পা বাড়িয়েছিলেন সেই পথ সহজ, সরল মধুময় ছিল না। দুর্গমের দুর্ভেদ্য পথ পাড়ি দিতে মনে ও মুখে যে প্রতিবাদী ভাবনার প্রকাশ তিনি দেখিয়েছেন তা স্বতন্ত্র রূপে চিহ্নিত; আর এখানেই কবি সুভাষ হয়ে উঠলেন রবীন্দ্র পরবর্তী তরুণ কবিদের মধ্যে চির স্বাতন্ত্র্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 473 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. বসু, বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা— ১, নিউ এজ সংস্করণ, মাঘ, ১৩৬৫, পৃ. ৮০
২. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা– ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭, পৃ. ৫৩
৩. সেন, মজুমদার, জহর, কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি, সাহিত্যসঙ্গী প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, বই মেলা ২০০৮, পৃ. ২৯০
৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ. ১৫
৫. তদেব, পৃ. ১৫
৬. তদেব, পৃ. ১৬
৭. তদেব, পৃ. ১৬
৮. তদেব, পৃ. ১৭
৯. তদেব, পৃ. ১৮
১০. তদেব, পৃ. ১৩৬
১১. তদেব, পৃ. ৬৪
১২. তদেব, পৃ. ৪৩
১৩. তদেব, পৃ. ৩৫
১৪. তদেব, পৃ. ৩৫
১৫. তদেব, পৃ. ৪৩
১৬. তদেব, পৃ. ৪৩
১৭. তদেব, পৃ. ৪৮
১৮. তদেব, পৃ. ৫৬
১৯. তদেব, পৃ. ৬২
২০. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা– ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭, পৃ. ৭৩–৭৪
২১. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ. ৪১